অনাম্নী অঙ্গনা

অরুণাংশ ভট্টাচার্য

সর্বাগ্রে একটা কথা আমরা বলে নিতে চাই, এখন, এই একবিংশ শতকে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক বা তিন-চার - অংকের নাটকগুলির বিভাজনগত কোনও তাৎপর্য নেই। অর্থাৎ কাব্যনাটক বা নাটক এ-রকম কোনও আলাদা অস্তিত্ব আমরা মানছি না। আমরা সবগুলিকেই দেখতে চাই কেবলমাত্র নাটক হিসেবে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে একটু অন্যরকম উপস্থাপনের চেষ্টা করি।

'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে বুদ্ধদেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির। ওই চরিত্রটির ব্যাখায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন, এই গোটা বিশ্বটাই একটা বিশ্ববিদ্যালয়। যুধিষ্ঠির সমস্ত জীবন ধরে শুধু শিক্ষার্থীর মতো সেখান থেকে কেবল পাঠ - সংগ্রহ করে গিয়েছেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর কাছে মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ নন, অর্জুন, কর্ণ বা দুর্যোধন কেউ নন—যুধিষ্ঠির। যিনি ভারতযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন না, সন্তানবৎ ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মৃত্যুতে তিনি তেমনভাবে বিভ্রান্ত, হতচকিত বা ক্রোধান্বিত—কিছুই নন। ভ্রাতাদের মৃতদেহ সামনে দেখেও যিনি বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক - আগ্রহী। অনেকাংশে অসফল, দ্যূতাসক্ত, সর্বোপরি, ধর্মকে যিনি মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় অনুভব করেন। ধর্ম যার কাছে প্রকৃতিপাঠ। স্বজন হারানোর বেদনার মধ্যেও যিনি জ্ঞানসঞ্চয়ের উৎসের কাছে আশ্চর্যভাবে নিবেদিত এবং ফলস্বরূপ নির্মমও। এ-ররকম একটি চরিত্রকে নায়কের মর্যাদা দেওয়ার মতো মানসিকতা বুদ্ধদেব বসুর আগে আমরা বাংলাসাহিত্যে পাইনি। তবে সন্দেহ নেই যে, এর বীজটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মধুসূদন দত্তর কাছ থেকে। কিন্তু, মধুসূদন যতখানি ট্রাজিক অনুভূতিতে আক্রান্ত ছিলেন, বুদ্ধদেব ততটা ছিলেন না। থাকতে চানও না। বরং বদলেয়ার যে-ভাবে আধুনিক বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা ও জটিলতাকে এক অনিবারণীয় রোমান্টিকতায় উন্নীত করেছিলেন, বাংলাসাহিত্যের মোড় ঠিক ওইভাবেই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। যে - জন্য শুধু যুধিষ্ঠির - ভাবনা নয়; তাঁর বিভিন্ন রচনার পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রেম ও যৌনতার মধ্যে আধুনিক সভ্যতার জ্বালানি চালান করে দিতে পেয়েছিলেন—যা জীবনানন্দের কবিতার মতোই, বুদ্ধদেবের সম-সময়ের আলোচকদের চিন্তাজগতের বাইরে ছিল। ফলে, তাঁর লেখায় অবসেশনের আধিক্য— এই মতবাদ সে - কালে প্রায়-সর্বস্তরেই গৃহীত ছিল। সময়ের নিয়মে আমাদের সে-অবস্থানের বদল হয়েছে, বুদ্ধদেবও আলোচিত হয়েছেন অন্য কৌণিকে। কিন্তু একবিংশ শতকে, যে - সময়ে আমরা প্রযুক্তির শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছি প্রায়, পাশাপাশি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা কর্কটরোগের ন্যায় গ্রাস করে ফেলেছে বিশ্বের জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও নাশকতায় জনিয়ে যাচ্ছে আমাদেরই পাশের বাড়ির মধ্যবিত্ত সংসারের মেধাবী ছেলেটি, সেখানে এই অবস্থান - বদলের পিছনে কোন অঙ্ক কাজ করে, তার উত্তর কোনও প্রচলিত ফর্মুলার পাওয়া যাবে না বলেই আমরা মনে করি। সে-জন্যই এই আলোচনার প্রথমদিকে আমরা বলতে চেয়েছিলাম—উহা নাটক আর ইহা কাব্যনাটক—এ-রকম কোনও বিভাজনরেখায় আমরা বিশ্বাসী নই। বুদ্ধদেব বসুর মতো বিস্ফারক ব্যক্তিত্ব আজ বেঁচে থাকলে, এমনটাই মনে করতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা-ই যদি হয়, তবে বুদ্ধদেব তো আর বেঁচে নেই, তাহলে এখন তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তার উত্তর আমরা এই আলোচনায় বুদ্ধদেবের নাটকগুলির মধ্য দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছি।

জীবনানন্দের কবিতা ও গল্প - উপন্যাসের নানারকম আলোচনা আমরা পড়েছি, করেছিও। একইসঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে, কোয়ান্টাম - থিয়োরি আবিষ্কৃত হওয়ার পর জীবনানন্দকে আমরা অন্যমাত্রায় আবিষ্কার করেছি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, জীবনানন্দের সময়কার আধুনিকতা ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, অর্থাৎ আধুনিকতার বিপদ তার পরবর্তিকালে সংস্কৃতি ও সমাজের কী সংকট সৃষ্টি করবে, তা জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন। যার পরিচয় আমরা এখন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আধুনিকতাকে কুক্ষিগত করতে চেয়ে 'মূলস্রোত' নামে এক 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' সাহিত্য ও সংস্কৃতির কী হাল করেছে, তা আমাদের অজানা নয়। আমাদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে আধুনিকতার যে-ধরনের বিপদ বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, সন্ত্রাস ভবিষ্যতে কী রূপ পরিগ্রহ করবে। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই তিনি জানিয়েছিলেন, 'হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে/ হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে কীটের গহ্বরে' এবং 'এ জগৎ মহাহত্যাশালা।' এই হত্যা অবশ্যই রাজনৈতিক হত্যা, এই হত্যার রাজনীতির অংশ। রাজনীতিগতভাবে এই হত্যায় কোনও অন্যায় নেই। যে-রাজনৈতিক হত্যা পরিচয় আমরা রামচন্দ্রের শূদ্রকবধের মধ্যে পেয়েছিলাম। এর মধ্যে ম্যাকবেথীয় ট্রাজেডি নেই। এ-হত্যা ডানকানকে হত্যা নয়। তার বেশ ধরে যে যতই বলুন —না-কেন, বুদ্ধদেবের নাটক ট্রাজিক, আমরা তা মানি না বরং আমরা বোঝাতে চাই, এ জগৎ কেন মহাহত্যাশালা, তার পিছনে গভীর কারণগুলিকে।

আমরা এমন বলতে চাই না যে, সন্ত্রাসের এখন যে -রূপ তা বুদ্ধদেব একেবারে নিশ্চিত জেনে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সন্ত্রাস যে-ভাবে ত্রাসে পরিণত হয় এবং আর ফসলস্বরূপ যে - নাশকতায় গোটা বিশ্ব আজ উন্মাদ, তা বুদ্ধদেব জ্যোতিষীর মতো বুঝেছিলেন। তা নয়। কিন্তু, সন্ত্রাস কীভাবে মানুষ লালন করে এবং তা যে ক্রমবর্ধমান — এটা তিনি মমে' অনুধাবন করেছিলেন। সঠিক অর্থে বলতে গেলে এটাও আধুনিকতার আর - একটি বিপদ। এগিয়ে -চলা পৃথিবীতে শান্তি এক মরীচিকামাত্র, তাকে স্বপ্নে ভাবা যায় শুধু, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। অথচ এর মধ্যেই মানুষ বাঁচে, আশা কুহকের সমগোত্রীয় হলেও সেটা অনির্বাচ্য এক প্রণোদনা মানুষের কাছে। হিংসা যেমন অবিনশ্বর, প্রতিবাদও তেমনই অনিঃশেষ—এটা আমরা আজ যেমনভাবে বুঝি, বুদ্ধদেব সেই সাতের দশকের আশপাশের সময়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা তেমনভাবেই বুঝেছিলেন। মুক্তির উন্মাদনা বা টেররাইজড করে রাখার বিরুদ্ধে যে-প্রতিবাদ, তাকে যেমনভাবে আমরা অস্বীকার করতে পারিনি, তেমনই তখনকার সন্ত্রাসও কীভাবে মৌলবাদে আক্রান্ত হয়েছিল, তা-ও আমাদের অজানা নয়। বুদ্ধদেবের প্রতিটি নাটকেই প্রায় এর পরিচয় আমরা পাই। যেমন 'প্রথম পার্থ' নাটকে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণের ভূমিকার কথা যদি আমরা স্মরণ করি, তাহলে বুঝতে পারি কর্ণ নামক একটি সত্তাকে কীভাবে সন্ত্রাসিত করে রাখা হচ্ছে। কীভাবে মাতৃসত্তা, লিবিডোর তাড়না এবং কূটনীতিকে প্রচ্ছন্ন এক সন্ত্রাস হিসেবে দেখাতে চাইছেন বুদ্ধদেব। এবং তা ক্রমে যে পরিণত হচ্ছে মৌলবাদে। অথচ কর্ণ নামক আলোকবর্তিকাটিকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে মৌলবাদ অসহায় হয়ে পড়লেই যে তা বাংলা সিনেমার মতো মিলনান্তক, তা ভাবার যেমন কারণ নেই, তেমনই এই সত্যটিকেও উপেক্ষা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তবে, এই সত্যটির সঙ্গে বর্তমানের ভারত - পাকিস্তান শান্তি - প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ট্রেন -বাস-বিমান চালানোর তুলনা চলে না। তা নেহাতই হাস্যকর। কেননা, মৌলবাদ যখন ধাক্কা খায়, তখন সে নাশকতার পথে যায়। বুদ্ধদেব সে-ইঙ্গিত আমাদের দিয়ে রেখেছিলেন। পাঠক 'অনাম্নী অঙ্গনা'-র কথা মনে করুন। সেখাড়েও দেখতে পাবেন অম্বিকার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সন্ত্রাস কেমনভাবে মৌলবাদে পরিণত হচ্ছে ক্রমে। আর

তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৃঢ় হচ্ছে অঙ্গনার নির্মম দৃঢ়তা। অঙ্গনা দাসী হয়েও একটা পর্যায়ে গিয়ে এমন মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করে ফেলেছে যে সে অম্বিকাকে বলতে পারে, 'দেবী ক্ষমা করুন। আপনার আদেশেও আমি তা পারবো না। অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা, এমন আমার দীন জীবনে এই আবির্ভাব। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত হোক। আমি নীরব থাকবো।'

এই মানসিক দৃঢ়তাকে আমরা শুধু দৃঢ়তা বলেই শেষ করতে চাই না। তা এক নিশ্চিত নির্মমতা। এই নির্মমতা অম্বিকার মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি না। এর মধ্যে আর একটি ব্যাপারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেটি হচ্ছে লিবিডোর তাড়না। অঙ্গনাকে ব্যাসদেব সম্পর্কে উত্তেজিত করেছিল অম্বিকাই। ব্যাসের সঙ্গে অঙ্গনার যৌনমিলন বুদ্ধদেবের অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়কে সম্পূর্ণতা দিয়েছে, এটা যেমন ঠিক, তেমনই ভবিষ্যতে ব্যাস - অঙ্গনার এ - জাতীয় মিলন আর কখনও হবে না, এটা সত্য হলেও সেই একবার মিলনের স্মৃতি, প্রকারান্তরে লিবিডো অঙ্গনা সমস্ত জীবন ধরে বহন এবং লালন করবে, সেটাও ঠিক। এ-ও তো একধরনের নির্মমতা। যেটা অম্বিকার কল্পনায়ও আসা সম্ভব নয়। অথচ দু-পক্ষই চিরকাল বেঁচে থাকবে। একই চিত্র পাঠক লক্ষ্য করবেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে। যেখানে তপস্বীর প্রেমভাবনার উদ্‌গম হয়েছিল প্রথমত তরঙ্গিণীর চুম্বন এবং বক্ষের বর্তুলাকার দুই মাংসপিণ্ডের স্পর্শে। যাতে আমরা মনে করি প্রেম - ভাবনাই একমাত্র মহৎ— তা নয়। শরীরও সম-পরিমাণে মহৎ। আর, তার চেয়েও মহৎ ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এই তপস্বীর স্ত্রী-পুত্র-পিতাকে ত্যাগ করে 'শূন্যতায়' ডুবে যাওয়ার মতো চরম এক নির্মমতা। নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ একজায়গায় বলেছেন, 'মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়— আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।' মনে পড়ে যাচ্ছে কি যুধিষ্ঠিরের কথা? মনে হচ্ছে না কি যুধিষ্ঠিরের মতো ঋষ্যশৃঙ্গের কাছেও এই পৃথিবী একটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়! এখানে তিনি একজন শিক্ষার্থী মাত্র। তাই এখানে শূন্যতা মানে শূন্যতা নয়, অন্ধকার নয়। ঋষ্যশৃঙ্গের আর একটি উক্তি এমন, 'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নতুন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না।' অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা শুরু হল ঋষ্যশৃঙ্গের। এবং তা ঐতরেয়র মতো, যুধিষ্ঠিরের মতো একজন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রকৃতি নামক এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। তাই বলে সন্ত্রাস শেষ হয় না কিন্তু। ঋষ্যশৃঙ্গের পাশাপাশি এই পৃথিবীতে প্রজন্মের -পর - প্রজন্ম বেঁচে থাকে বিভাণ্ডক-শান্তা-লোলাপাঙ্গী - চন্দ্রকেতুরা।

আমরা বুদ্ধদেবের 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকের প্রসঙ্গে যাব, তবে তার আগে অন্য দু-একটি কথা বলে নিই। ছয় - দশকের প্রায় - মাঝামাঝি সময় থেকে সত্তরের প্রথমার্ধের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু প্রধানত তাঁর নাটকগুলি লিখেছিলেন। এর ঠিক আগেই ঘটেছে খাদ্য - আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ইত্যাদি ঘটনাবলি। বাংলাসাহিত্য - বিষয়ক যাবতীয় আন্দোলনসমূহ এরই আগে-পরে হয়েছে। প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে নকশাল - আন্দোলন। এরপরেই 'মুক্তির দশক' নামে সেই টালমাটাল সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই পর্যন্ত একদিকে যেমন অস্থির সময়ের এক ধারাবাহিক ইতিহাস, অন্যদিকে একের-পর-এক আন্দোলনের অপমৃত্যু—এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেবের মতো মানুষ ত্রাস ও সন্ত্রাসের যে-চিহ্নগুলি লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে তার যে-পরিণতি অনুধাবন করেছিলেন, তাতে তাঁর বায়াসড হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বায়াসড কেন বলতে চাইলাম, সে-প্রসঙ্গে অন্যরকম একটি উদাহরণ দিই। অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, 'কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে, যখন তিনি এতো ভালো কবিতা লিখছেন।' অর্থাৎ, মানুষটি এত গুরুত্বপূর্ণ নন, যতটা বিশিষ্ট তাঁর কবিতা। কবিতাই সব এবং কবিতাই সমস্তকিছু। কবিতা সম্পর্কে এই বায়াসনেসই তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— এটা মনে রাখা দরকার যেমন, তেমনই সমাজের সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও যথেষ্ট আচ্ছন্ন ছিলেন বুদ্ধদেব। যার ফলে সন্ত্রাসের স্বরূপটি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কলকাতার ইলেকট্রা নাটকে এমনই এক আবহের পরিচয় আমরা পাই। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে বুদ্ধদেব মনোরমাকে বোঝালেও, আজ, এখন আমাদের মনে হয় মনোরমা, শম্পা বা অদ্রি প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কেন্দ্রীয় সমস্যা প্রত্যেকের এক ধরনের আচ্ছন্নতা। প্রতিটি চরিত্রই সন্ত্রাস নামে আচ্ছন্নতার এক বীজ বহন করে। সফোক্লেস, ইউরিপিদিস, হফমানস্টাল বা ইউজিন' ও নিল প্রত্যেকেই ইলেকট্রাকে ট্রাজিক চরিত্র করে দেখাতে চাইলেও বুদ্ধদেবের পার্থক্য এটাই। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনও পাঠক বা সমালোচক হয়তো অমত পোষণ করবেন, কিন্তু প্রযুক্তি - নির্ভর এই একুশ - শতক আমাদের চোখে কোনও ট্রাজেডি বা কমেডি মোহ বিস্তার করে না। যা করে, তা আতঙ্ক -ও-সন্ত্রাসে-ঘেরা মানুষের এক অনিবার্য পরিণতি। বুদ্ধদেবের নাটক পড়ে আজ আমাদের এ-কথা মনে হয়, মনে হতে থাকে।

সন্ত্রাস ও নাশকতা নামের বিষয়দুটিকে কেন আমরা বুদ্ধদেব বসুর নাটক প্রসঙ্গে টেনে আনলাম, সেটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্টার ওয়ার-এর ইতিহাস আমরা জানি, মনে আছে ভিয়েতনামে পরমাণু - বোমাবর্ষণের কথা, আমরা ভুলে যাইনি জিমি কার্টারের নিরস্ত্রীকরণ তত্ত্ব, মার্কিন অস্ত্রব্যবসা এবং বর্তমানে কমনওয়েলথ - ভুক্ত দেশগুলির সন্ত্রাসদমনের নামে এক হাস্যকর কর্মসূচি। এর মধ্যেই জন্ম হয়েছে আল - কায়েদা, এলটিটিই, লস্কর-ই-তৈবা কিংবা আলফা-র মতো জঙ্গি সংগঠনগুলি। পাল্লা-দিয়ে-ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও নাশকতা। মধুসূদন পদাঘাতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক মহাহত্যালীলা রূপে, বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন এই ক্রোধ, এই হত্যার পিছনে গভীর কারণ কী। স্বাধীনতা যেমন মানুষের জন্মগত অধিকার, সন্ত্রাসও তাই। উপেক্ষা, আপন, নিপীড়ন তাকে নাশকতার পথে নিয়ে যায়। এইরকমই-এক পেট্রোল -ভর্তি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সেই নক্ষত্রপুঞ্জের বিস্ফোরণ তখন হয়নি, হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আজ হয়েছে মাত্র। বুদ্ধদেবের নাটক সেই গভীর সূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দিল, নিশ্চিতভাবেই। কোন সাহসে তাঁর নাটকের বিভাজন করতে যাব আমরা?